কিতাবুস সিয়ার

(কানযুদ দাকায়িক)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

ফিকহে হানাফির কোনো একটা মুখতাসার মতন থেকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ কিতাবুস সিয়ার পেশ করার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে ছিল। কিন্তু কিছু ব্যস্ততা আর কিছু অলসতায় কাজটি হয়নি। এখন মনে হলো, দেরি না করে শুরু করে দিই। আস্তে আস্তে চলতে থাকুক। এ থেকেই আজ শুরু করা।

ইমাম নাসাফি রহ. (৭১০ হি.)-এর মুবারক কিতাব 'কানযুক দাকায়িক' ফিকহে হানাফির একটি প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মতন। কিতাবটির ভাষা যদিও অনেক সংক্ষেপ, এবং এ কারণে তালিবুল ইলমদের তা বুঝে উঠতেও একটু কষ্ট হয়, তথাপি এ মতনটি নির্বাচন করার কারণ হচ্ছে:

ক. অন্যান্য মতনের তুলনায় এ কিতাবে মাসআলার সংখ্যা একটু বেশি।

খ. তাবয়িন, বাহর, নাহর- এর মতো প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বেশ অনেকগুলো শরাহ এ কিতাবের রয়েছে। যেকোনো মাসআলায় তাফসিল দেখতে চাইলে সহজেই মুরাজাআত সম্ভব।

তাছাড়া কানযে মাসআলার তারতিব অনেকটা হিদায়ার তারতিবের কাছাকাছি। তাফসিল দেখতে চাইলে সহজেই হিদায়া, ফাতহুল কাদির, বিনায়া ইত্যাদি মুরাজাআত করা সম্ভব।

মাসআলাগুলো খুব সংক্ষেপে এবং দলীল প্রমাণ ও কিতাবাদির হাওয়ালা-রেফারেন্স ব্যতীত বলে যাবো। মতনে যতটুকু আছে, সামান্য ব্যাখ্যা করে বুঝানোর চেষ্টা করবো। প্রসঙ্গক্রমে হয়তো কিছু অতিরিক্ত মাসআলা এবং মাঝে মধ্যে কিছু কিতাবের হাওয়ালা আসবে। কেউ বিস্তারিত দেখতে চাইলে বাহর, ফাতহুল কাদির, শামি, মাবসূত, বাদায়ে ইত্যাদি কিতাব মুরাজাআত করতে পারেন ইনশাআল্লাহ।

ভাইদের কাছে আবেদন, কোনো মাসআলায় কোনো ভুল ধরা পড়লে যেন অবশ্যই আমাকে অবগত করেন, যাতে আমি শুধরে নিতে পারি।

সত্য কথা হচ্ছে, আমি বড় কোনো আলেম নই। তবে এদেশে জিহাদের উপর বেশ কাজ হলেও এখন পর্যন্ত ফিকহের কোনো কিতাব থেকে কিতাবুস সিয়ারের নিয়মতান্ত্রিক কাজ হয়নি। এ শূন্যতা অনুভব করেই আল্লাহর উপর ভরসা করে হাত দেয়া।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে কাজটি কবুল করেন। পূর্ণতায় পৌঁছার তাওফিক দেন। এর দ্বারা মুসলিম ও মুজাহিদ ভাইদের উপকৃত করেন। আখেরাতে নাজাতের অসিলা বানান। আমীন।

***

০১ জিহাদের হুকুম: কখন ফরযে কিফায়া, কখন ফরযে আইন

كتاب السّير

الجهاد فرض كفايةٍ ابتداءً. فإن قام به بعضٌ سقط عن الكلّ، وإلّا أثموا بتركه.

"(কাফেরদের বিরুদ্ধে) আগে বেড়ে জিহাদ করা ফরযে কিফায়া। কিছু মুসলিম এ দায়িত্ব (পূর্ণরূপে) আঞ্জাম দিয়ে দিলে সকলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। অন্যথায় সকলে জিহাদ তরকের কারণে গুনাহগার হবে।"

ব্যাখ্যা

ابتداءً (আগে বেড়ে)

কাফেররা যখন তাদের নিজেদের ভূমিতে অবস্থান করছে, মুসলিমদের কোনো ক্ষতি করছে না বা কোনো আগ্রাসানও চালাচ্ছে না, তখন মুসলিমদের উপর ফরয: আগে বেড়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এ জিহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন ও তার দেয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। যাতে কাফের মুমিন সকলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহর শরীয়তের অধীনে চলতে বাধ্য হয়।

কাফেরদেরকে অপশন দেয়া হবে:

ক. তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য তাদের সামনে তুলে ধরা হবে। ইসলামের ব্যাপারে তাদের কোনো কিছু জানার থাকলে জওয়াব দেয়া হবে।

খ. তারা মুসলমান হতে রাজি না হলে অপশন দেয়া হবে যে, তোমরা তোমাদের রাষ্ট্রের কতৃত্ব মুসলিমদের হাতে সমর্পণ কর। রাষ্ট্রের কতৃত্ব মুসলমানদের হাতে থাকবে। তোমরা ইসলামী শাসনের অধীনে সুখে শান্তিতে বাস করবে। মুসলমানদেরকে জিযিয়া দিয়ে যাবে। জিযিয়া কখন এবং কি পরিমাণ নেয়া হবে ইত্যাদি তাফসিল তাদের জানানো হবে।

গ. যদি এ দুই অপশনের কোনোটি গ্রহণ না করে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। তাদের রাষ্ট্র দখল করে তা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কাফেরদের ভূমিতে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করার জন্য এ জিহাদ ফরয। অর্থাৎ তারা আমাদের বিরুদ্ধে না আসলেও আগে বেড়ে জিহাদ করা আমাদের ফরয দায়িত্ব।

فرض كفايةٍ (ফরযে কিফায়া)

ফরয দুই প্রকার:

ক. ফরযে আইন। যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি। যাদের উপর ফরয, তাদের সকলকেই তা আদায় করতে হবে। কিছু মানুষের আদায়ের দ্বারা বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হবে না।

খ. ফরযে কিফায়া। যেগুলো মূলত সকলের উপরই ফরয। তবে সকলের পক্ষ থেকে কিছু মানুষ আদায় করে ফেললে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। যেমন জানাযা, কাফন দাফন। কিছু মুসলমান; মুসলিম মৃতকে গোসল দিয়ে জানাযা পড়ে কাফন দাফন যথাযথ করলে বাকি সকল মুসলিম দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কেউই না করলে এবং লাশ পড়ে থাকলে সবাই গুনাহগার হবে।

فإن قام به بعضٌ (কিছু মুসলিম এ দায়িত্ব পূর্ণরূপে আঞ্জাম দিয়ে দিলে)

পূর্ণরূপে বলা হয়েছে, কারণ, শুধু কিছু মানুষ শরীক হলেই দায়িত্ব আদায় হবে না, যদি কাজটি পূর্ণরূপে আঞ্জাম না পায়। কাজেই কিছু মুসলিম জিহাদ করলেই যে উম্মতের সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে তা না। বরং কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করে তাদের ভূমিতে ইসলামী শাসন জারি করতে যে দিকের সীমান্তে যতটুকু জিহাদ (প্রতি বছর) প্রয়োজন, ততটুকু করতে হবে। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে শরীক হতে পারে। কেউ জান দিয়ে, কেউ মাল দিয়ে, কেউ বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে। সকলে মিলে কাঙ্খিত পরিমাণ জিহাদ হলে তখন (এ বছরের) দায়িত্ব আদায় হবে।

وإلّا أثموا بتركه (অন্যথায় সকলে জিহাদ তরকের কারণে গুনাহগার হবে)

অর্থাৎ জিহাদ একেবার না হলে বা প্রয়োজন পরিমাণ না হলে, যারা যারা এর ব্যবস্থাপনায় শরীক হয়নি সকলে গুনাহগার হবে। অবশ্য সকলের গুনাহের মাত্রা সমান হবে না। দায়িত্বশীলরা বেশি গুনাহগার হবে। এমনিভাবে যাদের জানা ছিল যে ঠিকমতো জিহাদ হচ্ছে না কিন্তু এরপরও সামর্থ্যানুযায়ী তারা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, তারাও বেশি গুনাহগার হবে। সাধারণ মানুষ ও দুর্বল সামর্থ্যের লোকেরা কম গুনাহগার হবে। এভাবে যার যত বেশি অবহেলা তার তত বেশি গুনাহ হবে।

বি.দ্র. ০১

অনেকে বলে, তালেবানরা জিহাদ করছে, আমরা না করলেও সমস্যা নেই। তাদের এ কথা ভুল। কারণ, তালেবানরা ইকদামি তথা কাফেরদের ভূমি দখলের জিহাদ করছে না, বরং দিফায়ি তথা নিজেদের বাঁচানোর জিহাদ করছে। মুসলিমদের উপর ফরয হলো, নিজেদের ভূমি সংরক্ষণ রাখার পাশাপাশি কাফেরদের ভূমি দখল করা।

তাছাড়া কিছু মানুষ জিহাদ করলেই যে বাকিদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে তা নয়, যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে। বরং বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন কাফের ভূমিতে জিহাদ হওয়া আবশ্যক, যাতে কাফেররা আমাদের ভূমিতে আগ্রাসনের হিম্মত করতে না পারে এবং আস্তে আস্তে কাফেরদের ভূমিগুলো দখল হতে থাকে।

বি.দ্র. ০২

অনেকে মনে করেন, দাওয়াত ও তাবলিগের অনুমতি দিয়ে দিলে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েয নেই। তাদের এ ধারণা ভুল। কাফেররা মুসলমান না হলে বা তাদের রাষ্ট্র মুসলিমদের হাতে সমর্পণ করে যিম্মি হয়ে জিযিয়া দিয়ে বসবাস করতে রাজি না হলে কিতাল ফরয। কাফের রাষ্ট্রে দাওয়াত ও তাবলিগের অনুমতি দেয়াই যথেষ্ট নয়।

***

০২ যাদের উপর জিহাদ ফরয নয়

ولا يجب على صبيٍّ وامرأةٍ وعبدٍ وأعمى ومقعدٍ وأقطع.

“নাবালেগ, মহিলা, গোলাম, অন্ধ, লেংড়া ও যার উভয় হাত কাটা: তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।”

ব্যাখ্যা

এখানে জিহাদ বলতে ইসলামী সীমান্ত পাড়ি দিয়ে কাফের রাষ্ট্রে গিয়ে জিহাদ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ যখন ফরযে কিফায়া; তখন নাবালেগ, মহিলা, গোলাম ও শারীরিকভাবে অক্ষমদের উপর কাফের রাষ্ট্রে গিয়ে জিহাদ করা ফরয নয়। বরং এ অবস্থায় কাফের রাষ্ট্রে গিয়ে জিহাদ করা; শারীরিকভাবে সক্ষম স্বাধীন বালেগ পুরুষদের দায়িত্ব।

পক্ষান্তরে শত্রু যদি মুসলিম ভূমিতে হামলা করে বসে, তখন আপন আপন সামর্থ্যানুযায়ী সকলকে শরীক হতে হবে। এর আলোচনা সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

উপরোক্ত ইবারাতে মৌলিকভাবে চার প্রকার মুসলিমের কথা বলা হয়েছে, যাদের উপর জিহাদ ফরয নয়:

১ম প্রকার: নাবালেগ। কারণ, নাবালেগ মুকাল্লাফ তথা শরীয়তের বিধান পালনে আদিষ্ট নয়। তবে অভিভাবক অনুমতি দিলে নিরাপত্তা বজায় রেখে তারাও কিতালে শরীক হতে পারবে।

উল্লেখ্য, নাবালেগ বলতে শরীয়তের দৃষ্টিতে নাবালেগ উদ্দেশ্য; সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইনে নয়। যেমন কোনো ছেলের যদি তেরো বছরে স্বপ্নদোষ হয়ে যায়, তাহলে সে বালেগ; যদিও সামাজিকভাবে বা রাষ্ট্রীয় আইনে চৌদ্দ বা আটার বছর হওয়া পর্যন্ত শিশু, ছোট, অবুঝ, মত প্রকাশের অনুপযোগী বা আইন-কানুনের আওতামুক্ত মনে করা হয়।

বালেগ হওয়ার পর নামায-রোযা এবং জিহাদ-কিতালসহ যাবতীয় বিধি বিধান বর্তিয়ে যাবে।

পাগল: পাগলরা নাবালেগের হুকুমে। তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।

২য় প্রকার: মহিলা। তারা বালেগ হলেও জিহাদ ফরয নয়।

কারণ, তাদের শারীরিক গঠন দুর্বল এবং কিতালের অনুপযোগী। এজন্য বিবাহিত অবিবাহিত, যুবতী বৃদ্ধ কোনো মহিলার উপর জিহাদ ফরয নয়। এমনকি স্বামী অনুমতি দিলে বা আদেশ করলেও না। বরং বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে তাদেরকে জিহাদে নেয়াও ঠিক নয়। বিশেষত যদি সম্ভ্রম হানির আশঙ্কা থাকে। এর আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, কোনো নারী শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে বা অসৎ উদ্দেশ্যে কেউ তার দিকে হাত বাড়ালে, তখন নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা তার উপর ফরয। (মুগনিল মুহতাজ, খতিব শারবিনি)

৩য় প্রকার: গোলাম। বালেগ ও সক্ষম হলেও তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।

গোলাম অন্য দশজন পুরুষের মতো শারীরিকভাবে সক্ষম হলেও সে মূলত মুনিবের ব্যক্তিগত সম্পদ। কিতালে চলে গেলে মুনিবের খিদমত ও কাজ-কামে বিঘ্ন ঘটবে। নিহত হলে মুনিবের একটা সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই শারীরিকভাবে সক্ষম হওয়ার পরও তাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়নি। জিহাদের দায়িত্ব মুনিবের; যদি মুনিব বালেগ সক্ষম পুরুষ হয়। তবে মুনিব অনুমতি দিলে গোলামও জিহাদে যেতে পারবে।

৪র্থ প্রকার: শারীরিকভাবে অক্ষম স্বাধীন ও বালেগ পুরুষ।

অক্ষমদের এখানে তিনটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে: ১. অন্ধ; ২. লেংড়া; ৩. যার উভয় হাত কাটা।

এ চতুর্থ প্রকারের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো: অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব ইত্যাদি কারণে যারা অস্ত্র চালনা ও লড়াইয়ে অক্ষম, তাদের উপর কিতাল ফরয নয়। মুসান্নিফ রহ. তিনটি উদাহরণ এনেছেন। এছাড়াও শারীরিকভাবে অসমর্থ্য ও অক্ষম যত মুসলিম আছে, সকলের ব্যাপারেই একই কথা যে, তাদের উপর কিতাল ফরয নয়।

সংক্ষেপে: ১. নাবালেগের উপর জিহাদ ফরয নয়।

বালেগদের মধ্যে: ২. সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল ও অনুপযোগী হওয়ায় মহিলাদের উপর ফরয নয়।

৩. মুনিবের হক নষ্ট হবে বিধায় (মুনিব অনুমতি না দিলে) গোলামের উপর ফরয নয়।

৪. স্বাধীন পুরুষদের যারা বিশেষ কোনো অসুস্থতা বা দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়েছে তাদের উপরও ফরয নয়।

এছাড়া বাকি সকল (শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সামরিক-বেসামরিক, আলেম-গাইরে আলেম) সকল স্বাধীন পুরুষের উপর জিহাদ ফরয। মৌলিকভাবে এ দায়িত্ব তাদেরকেই আদায় করতে হবে।

***

বি.দ্র. ০১ সর্দি, কাশি, সামান্য জ্বর-মাথাব্যথা: এ ধরনের টুকটাক অসুখ জিহাদ ফরয হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক নয়। (মুগনি, ইবনে কুদামা)

বি.দ্র. ০২ শারীরিকভাবে অক্ষমদের সম্পদ থাকলে জিহাদের পথে প্রয়োজনীয় সম্পদ ব্যয় করা ফরয।

বি.দ্র. ০৩ শত্রু হামলা করে বসলে এবং স্বাধীন সক্ষম পুরুষরা প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট না হলে; মহিলা, গোলাম ও শারীরিকভাবে অক্ষম মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যাবে। সামর্থ্যানুযায়ী যে যেভাবে পারে শরীক হওয়া।

বি.দ্র. ০৪ মনে করা হয়, জিহাদ শুধু রাষ্ট্র বা সামরিক বাহিনির উপর ফরয, সাধারণ মুসলিমদের উপর ফরয নয়। এ ধারণা ভুল। কুরআন সুন্নাহ এবং ফিকহের কিতাবাদিতে বেসমারিক ও সাধারণদের বাদ দেয়া হয়নি, শুধু রাষ্ট্র বা সামরিকদের উপর ফরয এমন কথা বলা হয়নি।

বি.দ্র. ০৫ মনে করা হয়, তালিবুল ইলম ও আলেম উলামাদের উপর (বিশেষত যারা বড় আলেম) তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। এ ধারণা ভুল। কুরআন সুন্নাহ এবং ফিকহের কিতাবাদিতে উলামা তলাবাদের বাদ দেয়া হয়নি।

***

০৩ মুসলিম ভূমিতে আগ্রাসন হলে জিহাদ ফরযে আইন

وفرض عينٍ إن هجم العدوّ. فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيّده.

"শত্রু (কোনো মুসলিম ভূমিতে) আগ্রাসন চালালে (প্রতিরোধের জন্য) জিহাদ ফরযে আইন। তখন মহিলা ও গোলামরা তাদের স্বামী ও মুনিবের অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে যাবে।"

ব্যাখ্যা

ইবারাতে সামান্য বেশ-কমসহ এ মাসআলাটি প্রায় সব কিতাবে এভাবেই এসেছে যে, শত্রু আক্রমণ চালালে মহিলা এবং গোলামরা স্বামী ও মুনিবের অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে পড়বে। আসলে এটি একটি বিশেষ হালতের হুকুম। আক্রমণ হলেই তারা বের হয়ে পড়বে: বিষয়টি এমন নয়। বিষয়টি পরিষ্কার হতে ইমাম কুদুরি রহ. (৪২৮ হি.) প্রণীত 'শারহু মুখতাসারিল কারখি'র ইবারাতটি তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি। মুসলিম ভূমি আক্রান্ত হওয়ার সময়কার হুকুম সম্পর্কে সেখানে বলা হয়েছে,

(فإن ضعف من بالثغور بإزاء العدو ولحق من العدو أمر يخاف عليهم من قتل أو سبي أو ظهور عليهم فضعفوا عن دفعهم عن ذلك: فعلى من وراءهم من المسلمين أن ينفروا إليهم الأقرب فالأقرب منهم ... فإن كان فيمن احتيج إليه عبد جاز أن يخرج بغير إذن سيده.) وجملة هذا أن العبد لا يجوز له الجهاد ما دام بالمسلمين غنى عنه، إلا بإذن مولاه؛ لأن الفرض لا يجب عليه إذا كان هناك من يقوم به. ... (وكذلك النساء إذا اضطروا إلى قتالهن فليخرن بغير إذن أزواجهن.) ... لأن المرأة لا يجب عليها القتال إذا كان هناك من يقوم به. ... فأما إذا تعين الفرض واحتاج الناس إليها صار القتال من فروض الأعيان، فلم يقف على إذن الزوج. —شرح مختصر الكرخي للقدوري (ما بين المعكوفتين عبارة الكرخي فى المتن)، كتاب السير، ص: 667-664

"সীমান্তে শত্রুর মোকাবেলায় যারা আছে, যদি মনে হয় যে, তারা শত্রু প্রতিহত করতে সমর্থ হবে না এবং পরিস্থিতি এমন যে, আশঙ্কা আছে শত্রুরা তাদের হত্যা বা বন্দী করে নিয়ে যাবে কিংবা পরাজিত করে দখলদারিত্ব কায়েম করে ফেলবে, তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না: তাহলে নিকটবর্তীতার ক্রমানুসারে পেছনের মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হলো, তাদের রক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়া।

... যদি গোলামরা বের হয়ে পড়ার দরকার পড়ে, তাহলে মুনিবের অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে যেতে পারবে।

একটু ভেঙে বললে: গোলামদের ছাড়াই যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ মুনিবের অনুমতি ছাড়া গোলাম জিহাদে যেতে পারবে না। কারণ, যতক্ষণ অন্যরা (অর্থাৎ স্বাধীন বালেগ পুরুষরা) জিহাদ আঞ্জাম দিতে পারছে, ততক্ষণ গোলামদের উপর জিহাদ ফরয নয়।

... এমনিভাবে পুরুষরা যদি এমনই নিদারুণ নিরুপায় পরিস্থিতিতে পড়ে যায় যে, মহিলারা কিতালে বের হওয়া ব্যতীত (রক্ষার কোনো) উপায় নেই, তাহলে (এমন নিরুপায় পরিস্থিতিতে) মহিলারা যেন স্বামীদের অনুমতি ছাড়াই বেরিয়ে যায়। ... কারণ, অন্যরা যতক্ষণ যথেষ্ট হচ্ছে; মহিলাদের উপর কিতাল ফরয নয়। হ্যাঁ, কিতাল যদি মহিলাদের উপর অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে এবং (প্রতিরক্ষার জন্য) মহিলাদের (বের হওয়া) জরুরী হয়ে পড়ে: কিতাল করা তখন তাদের উপর ফরযে আইন। তাই তখন তা স্বামীর অনুমতির উপর আটকে থাকবে না।”

উপরোক্ত নস থেকে বুঝা যাচ্ছে: কোথাও আক্রমণ হলে প্রথমত তা প্রতিহত করার দায়িত্ব ঐ সীমান্তে যারা নিয়োজিত আছে বা অবস্থানরত আছে তাদের। তারা না পারলে বা না করলে তখন পেছনকার স্বাধীন বালেগ পুরুষরা। মুনিবের অনুমতি না হলে গোলামরা তখনও বের হতে পারবে না। স্বাধীন বালেগ পুরুষ এবং তাদের বালেগ পুরুষ গোলামরা মিলেও যদি প্রতিহত করতে সক্ষম না হয়, তখনই কেবল মহিলারা কিতালে বের হওয়ার পালা। যতক্ষণ পুরুষরা যথেষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ মহিলারা বের হবে না।

যতটুকু বুঝতে পারছি: ইকদামি জিহাদ যেমন স্বাধীন বালেগ পুরুষদের দায়িত্ব, দিফা তথা প্রতিরক্ষাও মূলত তাদেরই দায়িত্ব। যতক্ষণ তারা যথেষ্ট, গোলামরা মুনিবের অনুমতি ছাড়া কিতালে যেতে পারবে না। যদি পরিস্থিতি একান্তই নাজুক এবং অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে যে, গোলামরা বের না হলে প্রতিরক্ষা সম্ভব না, তখন ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষার জন্য গোলামরাও বেরিয়ে পড়বে: মুনিব অনুমতি দিক বা না দিক।

যদি তারা মিলেও প্রতিরক্ষায় সক্ষম না হয়, তখন সর্বশেষ পর্দানশীন মা বোনেরা ময়দানে বেরিয়ে পড়বে। যাতে তাদের স্বামী-সন্তানরা এবং বাপ-চাচারা শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে পারে এবং মুসলিম ভূমি শত্রুর পদানত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

সারকথা: এক জায়গায় আক্রমণ হলে সারা দুনিয়ার সকলের উপর জিহাদ ফরযে আইন; বিষয়টি এমন নয়। বরং যাদের উপর আক্রমণ হয়েছে, প্রথমত প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তাদের। তারা যথেষ্ট হলে, পেছনের মুসলমানদের উপর ফরযে আইন হবে না, বরং স্বাভাবিক অবস্থার মতো ফরযে কিফায়া। তারা না পারলে বা না করলে তখন তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর ফরযে আইন। এভাবে এ ফরয ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকবে এবং একসময় গোটা দুনিয়ার সকল মুসলমানের উপর ফরযে আইন হয়ে যেতে পারে।

যতটুকু বুঝতে পারছি: আগ্রাসনের অবস্থাটি একটি অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক অবস্থা। এমনও হতে পারে যে, পেছনের মুসলিমরা খবর পেয়ে ব্যবস্থা নিয়ে আসতে আসতে আক্রান্তরা হত্যা ও বন্দীর শিকার হতে পারে এবং শত্রুর হাতে পরাজিত হয়ে যেতে পারে। ইসলামের ভূমি কাফেরদের হাতে চলে যেতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ঐ এলাকার স্বাধীন পুরুষরা যথেষ্ট না হলে গোলামরা বেরিয়ে পড়বে। তারাও যথেষ্ট না হলে মহিলারা বের হবে। অতএব, এটি একটি বিশেষ পরিস্থিতির হুকুম। আক্রমণ হলেই গোলাম-মহিলা সকলে বের হয়ে যাবে বিষয়টি এমন নয়। বরং স্বাধীন পুরুষরা যথেষ্ট না হলে তখন গোলামরা, তারাও যথেষ্ট না হলে তখন মহিলারা বের হবে।

বি.দ্র. ০১ কোনো মুসলিম ভূমি আগ্রাসনের শিকার হলে যদি তা রক্ষা করা সম্ভব না হয় এবং কাফেরদের হাতে চলে যায়: তাহলে উম্মাহর উপর ঋণ হয়ে থাকবে উক্ত ভূমিকে উদ্ধার করা। (আজবিবাতুত তুসুলি)

বি.দ্র. ০২ স্বাধীন পুরুষ, গোলাম ও মহিলাদের মধ্যে যারা কিতাল করতে সক্ষম কেবল তারাই কিতালে বের হবে। যারা কিতালে সক্ষম নয়, তারা যে যতটুকু করতে পারে ততটুকু করবে। তাদের জন্য ততটুকুই ফরয। (শারহু মুখতাসারিল কারখি লিলকুদুরি, আলমুহিতুল বুরহানি, ফাতহুল কাদির)

বি.দ্র. ০৩ আগ্রাসন প্রতিহত করতে সশরীরে জিহাদ যেমন ফরয, প্রয়োজন পড়লে অর্থ-কড়ি ও ধন-সম্পদ ব্যয় করা এবং অস্ত্রপাতি ও অন্যান্য রসদ যোগান দেয়াও ফরয। যারা জিহাদের ব্যাপারে কিছুটা সচেতন, তারাও জিহাদ বিল-মালের ব্যাপারে ততটা সচেতন নই। বিষয়টি লক্ষণীয়।

***

০৪ অভিযান প্রস্তুতির জন্য জনসাধারণের উপর চাঁদা ধার্য করার হুকুম

وكره الجعل إن وجد فيءٌ وإلّا لا.

"(বাইতুল মালে) ফাই বিদ্যমান থাকলে (অভিযান প্রস্তুতির জন্য) জনসাধারণের উপর চাঁদা ধার্য করা মাকরুহ। অন্যথায় (অর্থাৎ ফাই বিদ্যমান না থাকলে) মাকরুহ নয়।"

ব্যাখ্যা

الجُعل: জিহাদি অভিযানে মুজাহিদ বাহিনি পাঠানোর জন্য বাহিনির প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, রসদপত্র ও অন্যান্য খরচাদির ভার মুসলিম জনসাধারণের উপর চাপানো। প্রত্যেকের উপর সামর্থ্যানুযায়ী অর্থের একটা অংক কিংবা কোনো বস্তু-দ্রব্য ধার্য করা।

ফাই: কাফেরদের থেকে যুদ্ধ ব্যতীত লব্ধ সম্পদ। যেমন: যিম্মিদের থেকে আহরিত মাথাপিছু জিযিয়া ও যমিনের খারাজ, দারুল হারবের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিনিময়ে লব্ধ অর্থ ইত্যাদি।

আর কাফেরদের থেকে যুদ্ধের মাধ্যমে যে সম্পদ হাসিল হয়, তাকে বলে গনিমত। গনিমতের খুমুস তথা এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা হবে। এটি গরীবদের হক। আর বাকি চারভাগ মুজাহিদরা পাবে, যারা যুদ্ধ করে এ গনিমত লাভ করেছে।

বাইতুল মালের ফাই মুসলিম জনসাধারণের হক। তাদের কল্যাণে এ সম্পদ ব্যয় হবে। জিহাদও যেহেতু মুসলিমদের কল্যাণে, তাই এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা বাইতুল মালের ফাইয়ের খাত থেকে করা হবে। যতক্ষণ ফাইয়ের খাতে সম্পদ থাকবে, মুসলিমদের ব্যক্তিগত সম্পদে কোনো দখল দেয়া যাবে না। চাঁদা ধার্য করা যাবে না।

উল্লেখ্য, মুসান্নিফ রহ. এর বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে: ফাইয়ের খাতে সম্পদ না থাকলে তখন জিহাদের প্রয়োজনীয় খরচাদি ও ব্যয়ভার জনগণের উপর ধার্য করা যাবে। তবে বাহর ও শামিতে বলা হয়েছে: বাইতুল মালের অন্যান্য খাত; যেমন যাকাত-উশর, গনিমতের খুমুস, খনিজ সম্পদ, পতিত ও লা-ওয়ারিশ সম্পদ: ইত্যাদি খাতে সম্পদ থাকলে, আপাতত সেখান থেকে কর্জ নিয়ে জিহাদের ব্যবস্থাপনা করা হবে। পরবর্তীতে ফাইয়ের খাতে সম্পদ জমা হলে তা দ্বারা অন্য খাত থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হবে। এভাবে যদি জিহাদের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলেও জনসাধারণের উপর কোনো চাঁদা আরোপ করা যাবে না।

হ্যাঁ, যদি বাইতুল মালে জিহাদের ব্যবস্থাপনা করা যায় মতো কোনো সম্পদ না থাকে, তখন জনসাধারণের উপর প্রয়োজন পরিমাণ চাঁদা ধরা যাবে। তবে ধনী-গরীব সবার উপর সমান ধরা

হবে না, সামর্থ্যানুযায়ী কম-বেশ করে ধরতে হবে। এ পরিমাণ ধরা যাবে, যাতে তা আদায় করতে তেমন কোনো বেগ পেতে না হয়।

যেহেতু জান-মাল উভয়টি দিয়েই জিহাদ করা মুসলিমদের উপর ফরয, তাই প্রয়োজনের সময় আর্থিক যোগান তাদেরকেই দিতে হবে।

বি.দ্র. ০১ উপরোক্ত আলোচনা সরকারিভাবে চাঁদা ধরার ব্যাপারে। স্বেচ্ছায় যদি কেউ মুজাহিদদের বা তাদের ফান্ডে কিছু দিতে চায়, যাতে তার এ সম্পদটুকু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হয়, তাহলে তা মহাপূণ্যের কাজ।

বি.দ্র. ০২ সবচেয়ে ভাল: প্রত্যেক মুজাহিদ তার নিজের খরচ নিজেই বহন করবে। কারও যদি সামর্থ্য না থাকে, তাহলে বাইতুল মাল থেকে বা অন্য মুসলিম ভাই থেকে সহায়তা নিতে পারে। (বাহর)

বি.দ্র. ০৩ বর্তমানে যেহেতু মুসলিমদের রাষ্ট্র নেই এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা বাইতুল মালও নেই, তাই বর্তমানে জিহাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা মুসলিমরা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে করতে হবে। এক্ষেত্রে যার সামর্থ্য যত বেশি তার দায়িত্বও তত বেশি।

***

০৫ কিতালপূর্ব দাওয়াত: ইসলাম গ্রহণ বা জিযিয়া কবুল

فإن حاصرناهم ندعوهم إلى الإسلام. فإن أسلموا؛ وإلّا إلى الجزية. فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولا نقاتل من لم تبلغه الدّعوة إلى الإسلام. وندعو ندبًا من بلغته. وإلّا نستعين بالله تعالى ونحاربهم.

“কাফেরদের (কোনো দুর্গ বা এলাকা) অবরোধ করার পর: ১. (প্রথমে) ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেবো। মুসলমান হয়ে গেলে তো ভাল। ২. অন্যথায় জিযিয়া (প্রদান করে যিম্মি হয়ে বসবাস)- এর দাওয়াত দেবো। তাতে সম্মত হলে (তারা দারুল ইসলামের বাসিন্দা ও নাগরিক হয়ে যাবে), (জান-মালের ক্ষতির শিকার হলে) যেমন সুবিচার আমরা (মুসলমানরা পরস্পর) পেয়ে থাকি তারাও পাবে, (কারো জান মালের ক্ষতি করলে) যেমন বিচার (ও শাস্তি) আমাদের উপর বর্তায়, তাদের উপরও বর্তাবে। যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, (দাওয়াত না দিয়ে) তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করবো না। যাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেছে, মুস্তাহাবরূপে তাদেরকে (আবারও) দাওয়াত দেবো। ৩. অন্যথায় (অর্থাৎ জিযিয়া প্রদান করত যিম্মি হতে সম্মত না হলে) আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবো।”

ব্যাখ্যা

এখান থেকে মুসান্নিফ রহ. كيفية القتال তথা কিতালের প্রক্রিয়ার বিবরণ শুরু করেছেন। অর্থাৎ কিতাল শুরুর আগে করণীয় কি? কিতালের সময় করণীয় কি? কাকে হত্যা করা যাবে, কাকে যাবে না? কেমন অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে? কি কি ধ্বংস করা যাবে? – ইত্যাদি।

কিতাল শুরুর পূর্বে করণীয়: ইসলাম গ্রহণ বা যিম্মি হওয়ার দাওয়াত

কিতাল শুরুর পূর্বে কাজ হচ্ছে, কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়া। মুসলিম শরীফে বুরায়দা রাদি.র হাদিসে এ দাওয়াতের মৌলিক পয়েন্টগুলোর ইজমালি বিবরণ এসেছে।

প্রথমত তাদের সামনে ইসলামের সত্যতা এবং সৌন্দর্য তুলে ধরা হবে। ইসলাম মানার কল্যাণ এবং না মানার ক্ষতি ইত্যাদি তুলে ধরা হবে এবং ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হবে। হয়ে গেলে তো ভাল। তারা আমাদের ভাই হয়ে যাবে। তাদের ভূমি দারুল ইসলামে পরিণত হবে। শরীয়াহর ছায়াতলে চলে আসবে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসিত হবে।

মুসলমান হতে রাজি না হলে জিযিয়ার দাওয়াত দেয়া হবে। জিযিয়ার দাওয়াত বলতে উদ্দেশ্য: আহলে যিম্মার পুরো নেজামটা তুলে ধরা। (আলজিহাদ ওয়াল কিতাল, খায়র হাইকল)

অর্থাৎ তাদের অবগত করা যে, যদি তোমরা মুসলমান হতে না চাও, তাহলে তোমাদের ভূমি আমাদের দায়িত্বে সমর্পণ কর। তা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসিত হবে। তোমরা তোমাদের আপন আপন মালিকানায় মুসলমানদের অধীনে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। তবে তোমাদের মুআমালা, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য মুসলমানদের মতো ইসলামী বিধান মতে চলবে। তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব আমাদের। বিনিময়ে তোমরা মাথাপিছু জিযিয়া দিবে আর তোমাদের যমিনে খারাজ আরোপিত হবে। জিযিয়া কাদের উপর বর্তাবে এবং বৎসরে কত করে, এমনিভাবে খারাজের পরিমাণ ও নিয়মাবলী কি হবে তা তাদের জানানো হবে।

মোটকথা, একজন অমুসলিম দারুল ইসলামে যিম্মি হয়ে বসবাস করতে কেমন বিধি বিধান; মোটামুটি তাদের জানানো হবে এবং যিম্মি হতে আহ্বান জানানো হবে। যদি তারা তাতে সম্মত হয়ে যায় তো ভাল। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা হবে। যখন তারা আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করে মুসলমান হতেও রাজি হলো না, এমনকি আল্লাহর দ্বীনের অধীনস্থ হয়ে যিম্মিরূপে বসবাস

করতেও রাজি হলো না: তখন দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে ফিরে বেড়ানোর অধিকার তাদের নেই। যমিন আল্লাহর। মাখলুক আল্লাহর। শাসনও চলবে আল্লাহর।

দাওয়াতের বিধান

উপরোল্লিখিত দাওয়াত যে কাফের ভূমিতে পৌঁছে গেছে, তাদের নতুন করে দাওয়াত দেয়া আবশ্যক নয়। যে ভূমিতে পৌঁছেনি, তাদের দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব। দাওয়াত না দিয়ে কিতাল করা নাজায়েয।

যদি শুধু ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে থাকে, যিম্মি হয়ে বসবাসের বিষয়টি না পৌঁছে থাকে, তাহলে এ বিষয়টি অবগত করতে হবে। নইলে কিতাল জায়েয হবে না। হতে পারে যিম্মি হয়ে থাকার সুযোগ আছে বিষয়টি জানতে পারলে তারা যিম্মি হতে সম্মত হয়ে যেতো।

যাদের কাছে ইসলাম ও জিযিয়া উভয় দাওয়াত কোনোভাবে পৌঁছে গেছে (হুকমি দাওয়াত) বা আমরা নিজেরা তাদের উভয় প্রকার দাওয়াত ইতিমধ্যে একবার দিয়েছি (হাকিকি দাওয়াত): তাদের নতুন করে দাওয়াত দেয়া হবে কি?

এ বিষয়টি মুসলিমদের কল্যাণ অকল্যাণের সাথে জড়িত। যদি এমন হয় যে,

ক. দাওয়াত দিলে মুসলমানদের ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই।

খ. এবং কাফেররা দাওয়াত কবুল করতে পারে আশা আছে।

এই দুই শর্ত পাওয়া গেলে আবারও দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব। কিতাবাদিতে যেখানে দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব বলা হয়েছে, সেখানে এ দুই শর্ত সাপেক্ষে মুস্তাহাব উদ্দেশ্য।

পক্ষান্তরে যদি নতুন করে দাওয়াত দিতে গেলে মুসলমানদের ক্ষতির আশঙ্কা হয় -যেমন কাফেররা সতর্ক হয়ে যাবে, প্রস্তুতি নিয়ে নিবে কিংবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনবে, ফলে তাদের বাগে আনা অত সহজ হবে না- তাহলে নতুন করে দাওয়াত দেয়া যাবে না।

এমনিভাবে যদি বুঝা যায় যে, তাদের নতুন করে দাওয়াত দেয়াতে কোনে ফায়েদা নেই, তারা দাওয়াত কবুল করবে না: তাহলেও দাওয়াত দেয়া মুস্তাহাব হবে না। বরং সুযোগ বুঝে এদের উপর অতর্কিত হামলা করাই মুনাসিব।

***

বি.দ্র. ০১ ফিকহের কিতাবাদিতে সাধারণত বলা হয়, কাফেরদের অবরোধ করার পর দাওয়াত দেয়া হবে। এর উদ্দেশ্য এটি নয় যে, আগে দাওয়াত দেয়া যাবে না। দাওয়াতের প্রক্রিয়া আগে থেকেই চলতে থাকতে পারে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন কাফের শাসকের কাছে চিঠি ও দাঈ পাঠিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন। অনেক সময় কাফেরদের প্রতিনিধি দল ইসলাম সম্পর্কে জানতে, আলোচনা করতে মদীনায় এসেছে। দাওয়াতের কাজটি এভাবেও সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। যদি কোনো কাফের কওমের সাথে এ ধরনের দাওয়াতের পর্ব আগে সম্পন্ন না হয়ে থাকে, বরং আচানক আমরা তাদের ভূমিতে গিয়ে অবরোধ আরোপ করে বসেছি, তখনকার কথা ফিকহের কিতাবাদিতে বলা হয়েছে যে, এদেরকে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব। আগে থেকে যাদের সাথে দাওয়াতের পর্ব সম্পন্ন হয়ে আছে, তাদের নতুন করে দাওয়াত দেয়া আবশ্যক নয়। উপরোক্ত দুই শর্ত পাওয়া গেলে মুস্তাহাব।

বি.দ্র. ০২ প্রতিটি কাফেরের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো জরুরী নয়। দায়িত্বশীলদের কাছে পৌঁছানোই যথেষ্ট, যারা চাইলে তাদের জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের শাসক ও গভর্নরদের কাছে চিঠি ও দাঈ পাঠিয়ে দাওয়াত দিতেন। জনগণ দায়িত্বশীলদের অনুগামী। রোম পারস্য এ ধরনের দাওয়াতের মাধ্যমেই বিজয় হয়েছে, প্রতিটি কাফেরের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো হয়নি। (আলজিহাদ ওয়াল কিতাল, খায়র হাইকল)

বি.দ্র. ০৩ দাওয়াত পৌঁছানোর পর কাফেররা যদি বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্য কিছু সময় চায়, তাহলে মুনাসিব মতো আমরা একটা সময় বেঁধে দেবো। এর মধ্যে ইসলাম গ্রহণ বা জিযিয়া কবুলের সিদ্ধান্ত নিলে ভাল, অন্যথায় কিতাল হবে। যেমন তিন দিন, এক সপ্তাহ বা একটু বেশ কম। খুব একটা দীর্ঘ সময় দেয়া হবে না, যে সময়ে আমাদের অনর্থক বসে থাকতে হবে, অপরদিকে তারা কোনো ষড়যন্ত্র বিছানোর সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। (আলজিহাদ ওয়াল কিতাল, খায়র হাইকল)

বি.দ্র. ০৪ দাওয়াতের উপরোক্ত বিধান ইকদামি জিহাদের ক্ষেত্রে, যখন আমরা কাফেরদের ভূমি দখল করতে হামলা করতে যাচ্ছি। পক্ষান্তরে যদি তারা আমাদের ভূমিতে হামলা করে বসে, তাহলে দাওয়াতের বিধান নেই। এ সময় কাজ: মুসলিম ভূমি হতে শত্রু বিতাড়ন। (শারহুস সিয়ার- সারাখসি, আহকামু আহলিযম্মিহ- ইবনুল কায়্যিম)

এর একটা উদাহরণ দেয়া যায়: হাদিসে সাপ মারার আগে সাপতে সতর্ক করতে বলা হয়েছে। কারণ, হতে পারে সেটা সাপ নয়, জিন। কিন্তু কোনো সাপ যদি অকস্মাৎ আপনার কোলে পড়ে যায়, তাহলে আপনি আগে কাপড় ঝাড়া দিয়ে সাপটি দূরে ফেলবেন। কাফেররাও সাপতুল্য। তাদের বিষয়টিও এমনই। আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে গেলে আগে পিটিয়ে বিতাড়িত করা হবে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

***

০৬ কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে এবং কি কি ধ্বংস করা যাবে

وإلّا نستعين بالله تعالى ونحاربهم بنصب المجانيق، وحرقهم، وغرقهم، وقطع أشجارهم، وإفساد زروعهم، ورميهم وإن تترّسوا ببعضنا ونقصدهم.

"(জিযিয়া প্রদানে যিম্মি হয়ে বাস করতে সম্মত) না হলে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে যুদ্ধ শুরু করবো। (প্রয়োজনে) মানজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র) স্থাপন করবো। তাদের জ্বালিয়ে দিবো। ডুবিয়ে দিবো। তাদের গাছ (বাগান) কেটে (উজাড় করে) দিবো। (ক্ষেত-মাঠের) ফসল নষ্ট করে দিবো। আমাদের কতক মুসলমানকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সামনে ধরলেও তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) উপর (তীর-বর্শা বা আগুন-পাথর) নিক্ষেপ করে চলবো। তবে (বাহ্যত তা গিয়ে মুসলিমদের উপর পড়লেও নিক্ষেপের দ্বারা) আমাদের টার্গেট থাকবে কাফেররা (মুসলিমরা নয়)।"

ব্যাখ্যা

মুসান্নিফ রহ. এখানে কাফেরদের বিরুদ্ধে কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে এবং তাদের কি কি ধ্বংস করা যাবে তার আলোচনা করেছেন।

প্রথমে মনে রাখতে হবে: আমরা এখন এমনসব কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা না আল্লাহর দ্বীন কবুল করেছে, না আল্লাহর দ্বীনের অধীনস্থ হয়ে বসবাস করতে সম্মত হয়েছে। উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাদের জান-মাল মুবাহ ও হালাল হয়ে গেছে। তাদের বশীভূত করতে দুনিয়ার স্বাভাবিক রণকৌশল অনুযায়ী সমরবিশেষজ্ঞগণ যে ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা মুনাসিব ও উপযোগী এবং উদ্দেশ্য হাসিলের পথে সহায়ক মনে করেন; ব্যবহার করা যাবে। যা কিছু ধ্বংস করা প্রয়োজন মনে করেন ধ্বংস করা যাবে।

স্বয়ং এসব কাফেরকে যখন হত্যা করে ফেলা জায়েয, তখন তাদের সম্পদের ব্যাপারে আর কি কথা থাকতে পারে! সম্পদের মূল্য তো জীবনের চেয়ে বেশি না।

বরং মুসলিমদের নিজেদের জান-মালই যখন বিলিয়ে দিতে হচ্ছে, তখন কাফেরদের জান মালের ব্যাপারে আর কি কথা থাকতে পারে!

তবে মনে রাখতে হবে: আমাদের মূল উদ্দেশ্য কাফেরদের হত্যা করে নির্মূল করে ফেলা বা তাদের সহায় সম্পদ ধ্বংস করে নিঃশেষ করে ফেলা নয়। বরং মূল উদ্দেশ্য তাদের শক্তি খর্ব করা। যাতে তারা বাধ্য হয়ে শেষে হয় ইসলাম গ্রহণ করে, কিংবা অন্তত তাদের রাষ্ট্র আমাদের হাতে সমর্পণ করে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে। এ উদ্দেশ্য হাসিল হতে যতটুকু হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞ প্রয়োজন করা যাবে। এর বেশি নিষ্প্রোয়োজন।

***

উপরোক্ত মূলনীতি বুঝার পর এবার মুসান্নিফ রহ. এর শব্দগুলোর ব্যাখ্যায় আসা যাক:

بنصب المجانيق – মানজানিক স্থাপন করবো: মানজানিক বলা হয় তখনকার যুগে ব্যবহৃত এক বিশেষ প্রকারের ক্ষেপণাস্ত্র জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র, যা দিয়ে বড় বড় পাথর ও আগুন নিক্ষেপ করা হতো। সাধারণত দুর্গ ও দুর্গ-প্রাচীর বা নগর-প্রাচীরে ভাঙন ও ফাটল ধরাতে এগুলো ব্যবহার করা হতো। আধুনিক ট্যাংক, কামান এবং গোলা ও মিসাইল নিক্ষেপক আবিষ্কার হওয়ার পর পুরোনো সেই মানজানিক এখন আর ব্যবহার হয় না।

মানজানিক থেকে নিক্ষিপ্ত পাথরে যখন প্রাচীর ও স্থাপনা ধ্বসে পড়বে, এসবের নিচে চাপা পড়ে মহিলা, শিশু ও অতিবৃদ্ধ যাদের হত্যা করা স্বাভাবিক অবস্থায় নিষেধ, তারাও মারা পড়বে- এটাই স্বাভাবিক।

মানজানিকের পাথরের আঘাতে অনেকে থেঁতলে যাবে।

নিক্ষিপ্ত আগুনে অনেকে ভস্ম হয়ে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তায়েফবাসীর বিরুদ্ধে মানজানিক স্থাপন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন যুদ্ধে মানজানিক ব্যবহার করেছেন। এ থেকে বুঝা গেল:

* স্বাভাবিক অবস্থায় যাদের হত্যা করা নিষেধ, বিধ্বংসী অস্ত্রের কবলে অনিচ্ছাকৃত মারা গেলে সমস্যা নেই।

* স্বাভাবিক অবস্থায় আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যা করা নিষেধ হলেও, বিধ্বংসী অস্ত্রের কবলে অনিচ্ছাকৃত পুড়ে মারা গেলে সমস্যা নেই।

* স্বাভাবিক অবস্থায় থেঁতলিয়ে মারা বা অঙ্গ-বিকৃতি ঘটানো নিষেধ হলেও, বিধ্বংসী অস্ত্রের কবলে অনিচ্ছাকৃত থেঁতলে গেলে বা অঙ্গ-বিকৃতি ঘটলে গেলে সমস্যা নেই।

উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী: আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা, বারুদ, মিসাইল ও বিস্ফোরক ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। কাফেরদের বশীভূত করতে যতটুকু প্রয়োজন ব্যবহার করা যাবে।

অবশ্য কোনো কাফেরকে বন্দী করে আনার পর আগুনে পুড়িয়ে, ট্যাংকের নিচে চাপা দিয়ে, পানিতে ডুবিয়ে, শরীরে বোমা বেঁধে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বা গাছের সাথে বেঁধে মিসাইল নিক্ষেপে হত্যা করা (হানাফি মাযহাব মতে) জায়েয হবে না। বরং তরবারির আঘাতে বা গুলি করে ইহসানের সাথে স্বাভাবিকভাবে হত্যা করতে হবে।

وحرقهم – তাদের পুড়িয়ে দিবো: অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় তাদের উপর মানজানিক, ট্যাংক, কামান বা অন্য কিছুর মাধ্যমে আগুন বা বিস্ফোরক নিক্ষেপ করা যাবে। এতে তারা ভস্ম হয়ে গেলেও সমস্যা নেই। অবশ্য বন্দী করে আনার পর আগুনে পুড়িয়ে মারা যাবে না, যেমনটা আগের পয়েন্টে বলা হয়েছে।

এমনিভাবে তাদের বাড়িঘর, স্থাপনা, মিল-ফ্যাক্টরি, অফিস-আদালত, ব্যাংক-ব্যালেন্স ইত্যাদিতে অগ্নি সংযোগ করতেও সমস্যা নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদি গোত্র বনু নজিরের বাগানে অগ্নি সংযোগ করেছিলেন।

উসামা রাদি.কে তৎকালীন খ্রিস্টান শাসিত ফিলিস্তিনের উবনায় অগ্নি সংযোগ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সহীহাইনসহ অন্যান্য কিতাবে এসব ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা এসেছে।

কারণ, এ অগ্নি সংযোগে তাদের সম্পদ ধ্বংস হবে এবং তারা দুর্বল হয়ে পড়বে। আর তাদের দুর্বল করাই আমাদের টার্গেট।

অবশ্য- যেমনটা শুরুতে বলা হয়েছে- যখন বিজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে, এসব সম্পদ বিজিত হয়ে আমাদের হাতে চলে আসার পথে আর কোনো বাধা থাকবে না: তখন কোনো কিছু ধ্বংস করা জায়েয হবে না। কারণ, তখন এগুলো ধ্বংস করার অর্থ বিনা কারণে আমাদের নিজস্ব সম্পদ ধ্বংস করা, যা তা নিষেধ। (ফাতহুল কাদির, শামি)

وغرقهم – তাদের ডুবিয়ে দিবো: অর্থাৎ তাদের পরাস্ত করতে যদি বাঁধ কেটে দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে তাদের বা তাদের বাড়িঘর, স্থাপনা ইত্যাদি ডুবিয়ে দেয়া সহায়ক মনে হয়, করা যাবে।

وقطع أشجارهم – তাদের গাছ বাগান কেটে উজাড় করে ফেলবো: অর্থাৎ তাদের পরাস্ত করতে যদি তাদের গাছ-গাছালি, বাগান ইত্যাদি কেটে ফেলা সহায়ক মনে হয়, কেটে ফেলা যাবে; যদিও ফলজ গাছ হয় এবং গাছে ফল বিদ্যমান থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদি গোত্র বনু নজিরের খেজুর বাগান কেটে দিয়েছেন। এর সমর্থনে সূরা হাশরের ৫ নং আয়াত নাযিল হয়:

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. –الحشر: 5

وإفساد زروعهم – তাদের ক্ষেত মাঠের ফল ফসল নষ্ট করে দিবো: অর্থাৎ তাদের পরাস্ত করার পথে সহায়ক হলে তাদের ফল ফসল নষ্ট করে ফেলা যাবে। যেমন ফসলের ক্ষেতে আগুন ধরিয়ে দিলাম। বাঁধ কেটে ফসল ডুবিয়ে দিলাম। বিষ প্রয়োগে পানি, মাছ ইত্যাদি নষ্ট করে দিলাম (মাবসূত)।

মোটকথা: তাদের শক্তি খর্ব করে তাদের পরাস্ত করতে এবং তাদের ভূমি দখল করে তা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করতে যতটুকু ধ্বংসযজ্ঞ চালানো দরকার, চালানো যাবে। পরিশেষে যখন কাফেরদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমাদের বিজয় নিশ্চিত হয়ে যাবে: তখন আর কোনো কিছু ধ্বংস করা যাবে না। কারণ, তখন কোনো কিছু ধ্বংস করার অর্থ আমাদের নিজস্ব সম্পদ বিনা কারণে ধ্বংস করা করা। আর বিনা কারণে সম্পদ নষ্ট করা নিষেধ (সহীহ মুসলিম)।

বি.দ্র. কাফেরদের দুর্গ বা সেনা ক্যাম্পে বা অন্য যেকোনো জায়গায়, যেখানে আমরা হামলা করা দরকার মনে করে হামলা করতে যাচ্ছি, সেখানে যদি কোনো মুসলিম বন্দী থাকে বা কোনো ব্যবসায়ী বা অন্য কোনো মুসলিম সেখানে বিদ্যমান থাকে, আর মনে হয় যে, হামলা করলে উক্ত মুসলিম মারা পড়বে, আবার তাকে বাঁচিয়ে হামলা করা সম্ভবও নয়: তাহলে আমরা হামলা করে দিবো। মুসলিম হত্যা আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে না। ঘটনাক্রমে তারা মারা পড়লে আমাদের গুনাহ হবে না। এর বিনিময়ে কোনো জরিমানা বা দিয়াতও দিতে হবে না। অবশ্য যখন মুসলিমকে বাঁচিয়ে হামলা করা সম্ভব, তখন এমনভাবে হামলা করা যাবে না যে, মুসলিম মারা পড়ে।

কাফেরদের নারী, শিশু ও অতিবৃদ্ধ যাদেরকে স্বাভাবিক অবস্থায় হত্যা করা নিষেধ, তাদের ব্যাপারেও একই কথা।

***

০৭ মানবঢাল ভেদকরণ

ورميهم وإن تترّسوا ببعضنا ونقصدهم.
"আমাদের কতক মুসলমানকে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সামনে ধরলেও তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) উপর (তীর-বর্শা, আগুন-পাথর) নিক্ষেপ করে চলবো। তবে আমাদের টার্গেট থাকবে কাফেররা।"

ব্যাখ্যা

কুদুরি কিতাবের বক্তব্য এখানে আরও একটু পরিষ্কার। সেখানে বলা হয়েছে,

ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر. وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم، ويقصدون بالرمي الكفار.

"কাফেরদের মাঝে কোনো মুসলিম বন্দী বা (মুসলিম) ব্যবসায়ী বিদ্যমান থাকলেও তাদের প্রতি (তীর-বর্শা ইত্যাদি) নিক্ষেপ করতে কোনো সমস্যা নেই। কাফেররা যদি মুসলিম শিশুদের বা (মুসলিম) বন্দীদের মানবঢাল হিসেবে সামনে ধরে, তাহলে এ কারণে মুজাহিদগণ কাফেরদের উপর নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবেন না। তবে নিক্ষেপের দ্বারা টার্গেট থাকবে কাফেররা।"

শরহে বেকায়ায় বলা হয়েছে,

ورمي ولو معهم مسلم، أو تترَّسوا به بنيَّتهم لا بنيَّته.

"তাদের সাথে কোনো মুসলিম থাকলে বা মুসলিমকে মানবঢাল হিসেবে সামনে ধরলেও নিক্ষেপ করে চলবো। তবে টার্গেট থাকবে তারা; মুসলিম নয়।"

অর্থাৎ আমরা যে দুর্গে বা ক্যাম্পে বা যেখানে হামলা করতে যাচ্ছি, হতে পারে সেখানে কাফেরদের হাতে কোনো মুসলিম বন্দী আছে। হতে পারে কোনো মুসলিম ব্যবসার জন্য দারুল হারবে গিয়েছিল, সে ঐ ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছে।

এ ধরনের ক্ষেত্রে মুজাহিদদের জন্য জরুরী হলো, এমনভাবে হামলা করার চেষ্টা করা, যাতে কোনো মুসলিম ক্ষতির শিকার না হয়।

কিন্তু অনেক সময় প্রোগ্রাম এভাবে সেট করা সম্ভব হয় না। মুসলিমকে বাঁচাতে হলে গোটা প্রোগ্রাম বাতিল করতে হবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে ঐ মুসলিমের জানের তুলনায় জিহাদ ও উম্মাহর স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে। মুজাহিদরা প্রোগ্রাম মুলতবি করবেন না। হামলা করবেন। তবে হামলার

দ্বারা উদ্দেশ্য থাকবে কাফেররা। অনুগামী হিসেবে মুসলিম মারা গেলে করার কিছু নেই। যদি মুসলিমকে জোরপূর্বক সেখানে নেয়া হয়ে থাকে, তাহলে এটা তার কপালের লিখন। এর বিনিময়ে সে প্রতিদান পাবে আল্লাহর কাছে। আর স্বেচ্ছায় গিয়ে থাকলে এ মুসিবত তার হাতের কামাই। মূলত দারুল হারব এমন একটা নিকৃষ্ট ও বিপজ্জনক জায়গা, যেখানে গেলে নিজের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা থাকে না।

মানবঢাল

এমনিভাবে যদি কাফেররা তাদের হাতে বন্দী থাকা মুসলিম নারী, পুরুষ বা শিশুদের মানবঢাল বানিয়ে সামনে ধরে যে, আমরা হামলা করতে গেলে আগে এসব মুসলিম আক্রান্ত ও হত্যার শিকার হবে। যেমন আমরা ক্যাম্পে হামলা করতে যাচ্ছি। কাফেররা মুসলিম বন্দীদের ধরে ক্যাম্পের সামনে, পেছনে বা ছাদের উপর বেঁধে রাখলো। যাতে তাদের রক্ষার্থে আমরা হামলা না করি। এটা তাদের একটা কৌশল।

এ ধরনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে, যেন মুসলিমদের বাঁচিয়ে হামলা করা যায়। একান্ত যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রোগ্রাম মুলতবি করা হবে না। হামলা করা হবে। নিয়ত থাকবে: আমরা কাফেরদের উপর হামলা করছি। অনুগামী হিসেবে মুসলিম মারা পড়বে এবং শহীদ হয়ে যাবে। এতে আমাদের কোনো গুনাহ হবে না। কোনো জরিমানাও আসবে না।

হিদায়াতে বলা হয়েছে,

لأنه قلما يخلو حصن من مسلم فلو امتنع باعتباره لانسد بابه.

"কারণ, দুর্গে সাধারণত কোনো না কোনো মুসলিম থাকেই। যদি এ দিকটি বিবেচনা করে বিরত থাকতে হয়, তাহলে জিহাদের দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে।"

কারণ, যখনই তারা বুঝবে যে, আমরা হামলা করতে যাচ্ছি, তখনই কিছু বন্দী মুসলিমকে এনে সামনে ধরে দেবে।

আরও বলা হয়েছে,

وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة لأن الجهاد فرض والغرامات لا تقرن بالفروض.

"মুজাহিদদের হাতে যেসব মুসলিম আক্রান্ত হবে, তাদের বিনিময়ে কোনো দিয়াত বা কোনো কাফফারা দিতে হবে না। কারণ, জিহাদ ফরয। ফরয আদায়ে জরিমানা আসে না।"

বি.দ্র. ০১ এটি মাসআলাগত দিক। তবে বাস্তব হচ্ছে: কোনো মুসলিম, এমনকি কোনো বেসামরিক কাফের মারা গেলেও শত্রুরা প্রোপাগান্ডার সুযোগ পেয়ে যায়। তাই একান্ত অনন্যোপায় বা মাসলাহাতের বিবেচনায় জরুরী না হলে, এমন ধরনের হামলা থেকে বেঁচে থাকাই জিহাদের জন্য কল্যাণকর। ওয়াল্লাহু তাআলা আ'লাম।

বি.দ্র. ০২ কাফেরদের নারী, শিশু, অতিবৃদ্ধ ও অন্যান্য যাদের স্বাভাবিক অবস্থায় হত্যা করা নিষেধ: উপরিউক্ত মানবঢালের মাসআলা তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

***

০৮ কুরআনে কারীম সাথে নেয়া এবং মহিলাদের জিহাদে নেয়া

ونهينا عن إخراج مصحفٍ وامرأةٍ في سرّيّةٍ يخاف عليها.

"সারিয়া (ছোট বাহিনি); যা পরাজিত হওয়ার শঙ্কা আছে, তাতে কুরআনে কারীম ও মহিলা সাথে নিতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে।"

ব্যাখ্যা

কুদুরিতে মাসআলাটি এভাবে বলা হয়েছে:

ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا عظيما يؤمن عليه، ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها.

"বিরাট বাহিনি; যা (সাধারণত) পরাজিত হওয়ার শঙ্কা নেই, মুসলিমরা তাতে মহিলা ও কুরআনে কারীম সাথে নিতে সমস্যা নেই। সারিয়া (ছোট বাহিনি); যা পরাজয়ের শঙ্কামুক্ত নয়, তাতে তা সাথে নেয়া মাকরুহ।"

দুই কিতাবের সম্মিলিত ভাষ্য দাঁড়াচ্ছে: ছোটখাটো বাহিনি; যা পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাতে মহিলা ও কুরআনে কারীম সাথে নেয়া নিষেধ। কারণ, বাহিনি পরাজিত হলে কাফেররা মহিলাদের সম্ভ্রমহানী করবে, কুরআনে কারীমের অবমাননা করবে।

একই কারণে এ ধরনের বাহিনিতে হাদিস বা ফিকহের কিতাবাদি নেয়াও নিষেধ, যাতে তা অবমাননার শিকার না হয়।

পক্ষান্তরে বাহিনি যদি এত বিশাল হয় এবং মুজাহিদরা যদি এত মজবুত হয় যে, আপাত দৃষ্টিতে পরাজয়ের শঙ্কা নেই, তাহলে তাতে কুরআন, হাদিস, ফিকহ কিংবা মহিলা সাথে নিতে সমস্যা নেই।

ফাতহুল কাদিরে বলা হয়েছে: বাহিনি ছোট-বড় নিয়ে কথা না। যেখানে সম্ভ্রমহানি বা অবমাননার শিকার হওয়ার আশঙ্কা আছে, সেখানে নেয়া যাবে না; যদিও বাহিনি বড় হয়। যেখানে এমন আশঙ্কা নেই, সেখানে নেয়া জায়েয।

আলবাহরুর রায়িকে বলা হয়েছে: মহিলাদের বিলকুল সাথে না নেয়াই নিরাপদ। ঘরই মহিলাদের নিরাপদ স্থান। রান্না-বান্না ইত্যাদি কাজের জন্য মহিলাদের নেয়ার জরুরত পড়লে, বৃদ্ধাদের নিবে। যুবতীদের কোনো অবস্থায়ই নিবে না।

***

বি.দ্র. ০১ হজ্বে যেমন মহিলারা মাহরাম ছাড়া যেতে পারে না, জিহাদেও মাহরাম ছাড়া যেতে পারবে না। হজ্ব ফরযে আইন হওয়ার পরও যখন মাহরাম ছাড়া যাওয়ার সুযোগ নেই, তখন জিহাদ; যা মহিলাদের উপর ফরয নয়, তাতে মাহরাম ছাড়া যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। (মিনহাতুল খালিক)

বি.দ্র. ০২ জিহাদে যাওয়ার পথে, যাওয়ার পর ময়দানে এবং বাড়ি ফিরার পথে: সর্বাবস্থায় মহিলাদের পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। (শারহুস সিয়ারসহ অন্যান্য কিতাব থেকে এমনটাই পরিষ্কার বুঝা যায়)

বি.দ্র. ০৩ মুসলিম যদি আমান নিয়ে দারুল হারবে যায়, আর কাফেররা কুরআনে কারীম বা সাথে নেয়া অন্য কোনো দ্বীনি কিতাবের অবমাননা করবে না বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে তা সাথে নিতে সমস্যা নেই। (হিদায়া)

***

প্রশ্ন: সরকার বিরোধী যেসব আন্দোলনে ধরপাকড়ের সম্ভাবনা থাকে যথেষ্ট, কুরআন সাথে পেলে অবমাননার আশঙ্কাও থাকে যথেষ্ট: সেগুলোতে আবেগের বশে কুরআন সাথে নেয়ার কি বিধান হতে পারে? উপরোক্ত মাসআলা থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যাচ্ছে আশাকরি।

***

০৯ গাদ্দারি, গনিমতের মাল চুরি ও অঙ্গবিকৃতি নিষেধ

ونهينا عن ... وغَدرٍ وغُلولٍ[1] ومُثلةٍ.

[1]وَمِنْهُ الْغُلُولُ فِي الْغُنْمِ، وَهُوَ أَنْ يُخْفَى الشَّيْءُ فَلَا يُرَدُّ إِلَى الْقَسْمِ. -مقاييس اللغة (4/ 376)

“গাদ্দারি করা, গনিমতের মাল লুকিয়ে ফেলা এবং অঙ্গ-বিকৃতি করা থেকে আমাদের বারণ করা হয়েছে।”

ব্যাখ্যা

غَدر বলা হয় চুক্তি বা অঙ্গীকার করার পর গাদ্দারি করা। যেমন কাফেরদের কোনো দলের সাথে তিনদিনের যুদ্ধবিরতি হলো। তিনদিন হামলা হবে না ভেবে কাফেররা অপ্রস্তুত রইল। এই সুযোগে হঠাৎ হামলা করে বসলো। এটি গাদ্দারি। গাদ্দারি হারাম।

উল্লেখ্য, হাদিসে এসেছে الحرب خدعة ‘যুদ্ধ হচ্ছে কৌশলের নাম’। এই ‘খিদা’ – ‘কৌশল’ আর ‘গাদ্দারি’ এক নয়। খিদা’ জায়েয[2] বরং এটিই যুদ্ধের মোড় নির্ধারণ করে। গাদ্দারি হচ্ছে অঙ্গীকার বা চুক্তি করার পর তা রক্ষা না করে সুযোগ বুঝে ভঙ্গ করে ফেলা। পক্ষান্তরে খিদা হচ্ছে কৌশলে মার দেয়া। যেমন আমরা এমন একটা ভাব দেখালাম যে, আমরা তিনদিন কোনো যুদ্ধ করবো না, কিংবা আমরা যুদ্ধে ইচ্ছুক নই, আমরা ফিরে যাচ্ছি। কাফেররা এই ভেবে যখন অপ্রস্তুত হয়ে গেল, সুযোগ বুঝে হঠাৎ হামলা করে দিলাম। এখানে আমরা কোনো চুক্তি বা অঙ্গীকার করিনি। কৌশলে ফাঁদে ফেলেছি। এটি জায়েয এবং কাম্য।

غُلول অর্থ গনিমতের মাল লুকিয়ে ফেলা। গনিমতের মাল দশের হক। মুজাহিদগণ পাবেন চার ভাগ। আর খুমুস তথা এক পঞ্চমাংশ যাবে বাইতুল মালে। এটি গরীবদের হক। কোনো মুজাহিদের জন্য গনিমতের কোনো অংশ; বণ্টনের আগে নিয়ে নেয়া জায়েয হবে না; তা যত সামান্যই হোক।

অবশ্য দারুল হারবে থাকাবস্থায় খানাপিনার জরুরত গনিমতে বিদ্যমান থাকা খাবার ও খাবার উপযোগী বস্তু থেকে মিটানো যাবে। যেমন রুটি, চাল-ডাল ইত্যাদি। এমনিভাবে গনিমতের গরু ছাগল বা উট জবাই করে রান্না করে খাওয়া যাবে। তবে দারুল ইসলামে ফিরে আসার পর আর খাওয়া যাবে না। কারও হাতে কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকলে ফিরত দিতে হবে। এ ব্যাপারে গনিমতের পরিচ্ছেদে আলোচনা আসবে। সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

---

[2] الاختيار لتعليل المختار (4/ 120): والغدر: نقض العهد فلا يجوز بعد الأمان، ولا بأس به قبله وهو حيلة وخدعة، قال – عليه الصلاة والسلام –: «الحرب خدعة». اهـ

مُثْلَة অর্থ অঙ্গবিকৃতি ঘটানো। যেমন নাক কান কাটা। থেঁতলে দেয়া। হাত পা ভেঙে দেয়া বা কেটে বিচ্ছিন্ন করা। কিংবা আগুনে পুড়িয়ে, গাড়ি চাপা দিয়ে বা অন্য এমন কোনো পন্থায় হত্যা করা, যার দ্বারা দেহ বিকৃত হয়ে যায়।

কাফেরকে অঙ্গবিকৃত করে হত্যা করা নিষেধ। এমনিভাবে হত্যার পর অঙ্গবিকৃত করাও নিষেধ।

তবে এ নিষেধাজ্ঞা কাফেরকে বন্দী করে আনার পর ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে:

ক. ব্যাপক আক্রমণের কবলে পড়ে যদি কেউ ভস্ম হয়ে যায়, থেঁতলে যায় বা অঙ্গহানি বা অঙ্গবিকৃতির শিকার হয়- তাহলে নাজায়েয হবে না। এ ব্যাপারে আগে আলোচনা গেছে।

খ. এমনিভাবে কোনো কাফেরের সাথে কিতাল চলাবস্থায় যদি মুজাহিদের আঘাতে সে বিকৃত হয় তাহলেও সমস্যা নেই। যেমন মারামারির হালতে একটা কোপ দিলো, যা তার নাক উড়িয়ে দিল। আরেকটা কোপ দিলো, মুখে লেগে মুখ বিকৃত হয়ে গেল। আরেকটা কোপ দিল, একটা হাত কেটে গেল বা চোখ নষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে যখন মুজাহিদ পূর্ণ সুযোগ পেল, গলা কেটে হত্যা করে দিল। কাফের যতক্ষণ মারামারির হালতে থাকবে, এ ধরনের বিকৃতি ঘটলে সমস্যা নেই। এখানে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটানো হয়নি, মারামারির হালতে অনেকটা অনিচ্ছায় বিকৃতি ঘটেছে।

গ. রইলো মারামারির হালতে যদি মুজাহিদ স্বাভাবিক গলা কেটে বা মাথায় বা বুকে গুলি করে হত্যা করতে সক্ষম হন, তখন কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা জায়েয হবে কি?

'আলইখতিয়ার' কিতাবের ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, কিতালের হালে স্বাভাবিক হত্যা করা সম্ভব হলেও স্বাভাবিক হত্যা না করে এভাবে হত্যা করা জায়েয, যাতে কাফেরদের মাঝে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি হয়।[3] আইনি রহ. রমজুল হাকায়িকে একে সমর্থন করেছেন। শামি রহ.- এর অভিমতও এমনই; যদিও ফাতহুল কাদির থেকে এর বিপরীত বুঝা যায়।

[3] الاختيار لتعليل المختار (4/ 120): والمثلة المنهية بعد الظفر بهم، ولا بأس بها قبله لأنه أبلغ في كبتهم وأضر بهم. اهـ

এ তিন হালতে মুছলা তথা অঙ্গবিকৃতি শরীয়ত পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে কাফেরদের বন্দী করে আনার পর যখন আমরা তাদের স্বাভাবিকভাবে হত্যা করতে পারি, তখন অঙ্গবিকৃত হয় মতো করে হত্যা করা নাজায়েয। এমনিভাবে হত্যার পর অঙ্গবিকৃত করাও নাজায়েয।

এ ধরনের বিষয়াশয় লক্ষ না করে চলার কারণে আই এস কতটুকু সমালোচনার শিকার হয়েছে এবং জিহাদের কতটুকু বদনাম হয়েছে তা সকলের জানা। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

***

১০ যেসব কাফেরকে হত্যা করা নিষেধ এবং এ নিষেধের ক্ষেত্র

ونهينا عن ... وقتلِ امرأةٍ وغيرِ مكلّفٍ وشيخٍ فانٍ وأعمى ومقعدٍ[4]؛ إلّا أن يكون أحدهم ذا رأيٍ في الحرب أو ملكًا.

"এবং আমাদের বারণ করা হয়েছে মহিলা, গাইরে মুকাল্লাফ, শায়খে ফানি, অন্ধ এবং পঙ্গুদের হত্যা করতে। তবে তাদের কেউ যুদ্ধে নির্দেশনা-প্রদানকারী কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান হলে (হত্যা করা যাবে)।"

ব্যাখ্যা

কাফেরদের মধ্য থেকে কাকে কাকে হত্যা করা নিষেধ এবং এ নিষেধাজ্ঞা কখন প্রযোজ্য- মুসান্নিফ রহ. এ ইবারাতে তার আলোচনা করেছেন।

হাদিসে মহিলা এবং নাবালেগ শিশুদের হত্যা করতে পরিষ্কার নিষেধ এসেছে। এছাড়া কয়েকটি জয়িফ হাদিসে আরও কয়েক শ্রেণীর কাফেরকে হত্যা করতে নিষেধ এসেছে। জয়িফগুলো যদি বাদ দিই, তাহলে এতটুকু পরিষ্কার যে, মহিলা ও নাবালেগ শিশুকে হত্যা করা নিষেধ।[5]

নাবালেগকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ সে গাইরে মুকাল্লাফ। অর্থাৎ সে এখনও ইলাহি বিধি বিধান পালনে আদিষ্ট হয়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে **পাগলকেও** হত্যা করা নিষেধ। কারণ, সে-ও ইলাহি বিধি বিধান পালনে আদিষ্ট নয়। মুসান্নিফ রহ. এর বক্তব্যে وغيرِ مكلّفٍ দ্বারা এ দুই শ্রেণীর কাফের উদ্দেশ্য।[6]

[4] الْمُقْعَد بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ. اه رد المحتار: 6\660 (... وَمُقْعَدٍ) أَيْ أَعْرَجَ فَتْحٌ. اه رد المحتار: 4\126

[5] যদি তারা কোনোভাবে যুদ্ধে শরীক না হয়। এ ব্যাপারে আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

[6] البحر الرائق (5/ 84): وغير المكلف شامل للصبي والمجنون. اه

মহিলা মুকাল্লাফ তথা ইলাহি বিধি বিধান পালনে আদিষ্ট হলেও, তাকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কারণ: স্বভাবত মহিলাদের শারীরিক গঠন যুদ্ধ করার উপযোগী নয়। তাছাড়া কিছু ব্যতিক্রম বাদে মহিলারা যুদ্ধ করতে আসেও না। যুদ্ধের দায়িত্ব সাধারণত পুরুষরাই পালন করে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের শারীরিক গঠন যুদ্ধের উপযোগী করে বানিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মহিলারা مقاتل তথা যুদ্ধে সক্ষমদের কাতারে পড়ে না, বরং عاجز তথা যুদ্ধে অক্ষমদের কাতারে পড়ে। পুরুষরা পরাজিত হলে মহিলাদের তরফ থেকে আর তেমন কোনো প্রতিরোধ বা ক্ষয়-ক্ষতির আশঙ্কা নেই। এই একই কারণে মুসলিম মহিলাদের উপর সশস্ত্র কিতাল ফরয নয়।

যে কারণে মহিলাদের হত্যা করা নিষেধ, যেসব কাফেরের মধ্যে সে কারণটি পাওয়া যাবে, তাদেরকেও হত্যা করা নিষেধ হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই **অন্ধ, পঙ্গু, প্যারালাইসিস জাতীয় কাফের এবং শায়খে ফানিকে** হত্যা করা নিষেধ হবে।[7] কারণ, মহিলাদের মতো তারাও সাধারণত কিতাল করতে অক্ষম।

সংক্ষেপে: মহিলাদের হত্যা নিষেধ থেকে বুঝা গেল, শারীরিক কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে যারা সাধারণত কিতাল করতে সক্ষম নয়, তাদের হত্যা করা নিষেধ। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ফুকাহায়ে কেরাম আরও কয়েক শ্রেণীর কাফেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

অন্য কথায়: মহিলা ও নাবালেগ শিশুদের হত্যা নসের দ্বারা নিষেধ। অন্যদেরটা ইজতিহাদি। এ কারণে অন্য কাফেরদের কাকে হত্যা করা যাবে আর কাকে যাবে না এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের ইখতিলাফ রয়েছে। আমরা উপরে যে আলোচনা করলাম, তা হানাফি মাযহাবের সিদ্ধান্ত।

শায়খে ফানি

শায়খে ফানি হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত:

ক. কিতাল করার মতো শারীরিক শক্তি নেই (যদিও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব সুস্থ)।

খ. কাফেরদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ বেঁধে গেলে চিৎকার করে নিজ দলকে উদ্বুদ্ধ করার মতো শক্তিও নেই।

গ. সন্তান জন্ম দেয়ার শক্তি নেই।

---

[7] শায়খে ফানির ব্যাখ্যা সামনে আসছে।

কোনো কাফের এতটুকু শক্তিহীনতার পর্যায়ে পৌঁছে গেলে, সুস্থ-মস্তিষ্ক-সম্পন্ন এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব সুস্থ হলেও তাকে হত্যা করা যাবে না।

إلّا أن يكون أحدهم ذا رأيٍ في الحرب أو ملكًا - তবে তাদের কেউ যুদ্ধে নির্দেশনা-প্রদানকারী কিংবা রাষ্ট্রপ্রধান হলে হত্যা করা যাবে

অর্থাৎ শারীরিক প্রতিবন্ধীত্ব এবং অক্ষমতার কারণে যাদের হত্যা করা নিষেধ ছিল, তাদের কেউ যদি যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ হয় এবং কাফের বাহিনিকে বুদ্ধি পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করে, তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে।

মুলতাকাল আবহুরে বলা হয়েছে,

أو ذا مال يحث به. –ملتقى الأبحر: 415

"কিংবা যদি সম্পদের অধিকারী হয়, যারা দ্বারা সে (নিজ বাহিনিকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে) উদ্বুদ্ধ করছে।"

হিদায়াতে বলা হয়েছে,

وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء دفعا لشره. –الهداية (2/ 381)

"এমনিভাবে তাদের কেউ সরাসরি যুদ্ধে চলে আসলে, অনিষ্ট দমনের স্বার্থে তাকেও হত্যা করা যাবে।"

তাদের কেউ রাষ্ট্র প্রধান হলে তাকেও হত্যা করা যাবে। কেননা, সরাসরি যুদ্ধ করা কিংবা বুদ্ধি পরামর্শ বা সম্পদ দিয়ে সহায়তা করার চেয়েও তার অনিষ্ট বেশি। রাষ্ট্র প্রধানকে হত্যা করে দেয়া সম্ভব হলে সাধারণত বাহিনির মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

সারকথা

যেকোনো কাফের; পুরুষ হোক মহিলা হোক, সক্ষম হোক অক্ষম হোক: ক. মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হলে, খ. সম্পদ দিয়ে গ. কিংবা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে কাফের বাহিনিকে সহায়তা করলে ঘ. কিংবা সে রাষ্ট্র প্রধান হলে তাকে হত্যা করা জায়েয।

সরাসরি যুদ্ধে না আসলে, বুদ্ধি পরামর্শ কিংবা ধন সম্পদ দিয়ে কাফের বাহিনিকে কোনো সহায়তা না করলে এবং রাষ্ট্র প্রধান না হলে: মহিলা, নাবালেগ শিশু ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ও অক্ষম কাফেরদের হত্যা করা যাবে না।

এছাড়া বাকি সকল বালেগ কাফেরকে হত্যা করা জায়েয- যদিও তারা যুদ্ধে না আসে। এক্ষেত্রে সামরিক ও বেসামরিক কাফেরের মাঝে কোনো তফাৎ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্থ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী নয় এমন সকল বালেগ কাফের 'মুকাতিল' তথা সামরিক। (শারহুস সিয়ার, বাদায়িউস সানায়ি')

বি.দ্র. ০১

সামরিক বেসামরিক সকল সুস্থ বালেগ কাফেরকে হত্যা করা যদিও জায়েয, তথাপি বিশেষ কোনো ফায়েদা বা জরুরত না থাকলে সাধারণ কাফেরদের হত্যা না করাই ভাল। নেতৃত্বস্থানীয় এবং সামরিক কাফেরদের টার্গেট করা উচিৎ। কোনো কোনো হাদিসে কৃষক, গোলাম ও মজদুরদের হত্যা করতে যে না করা হয়েছে, তা দ্বারা এটিই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মূলত হত্যা জায়েয, তবে জরুরত বা বিশেষ কোনো ফায়েদা না থাকলে হত্যা না করা ভাল। বিস্তারিত শারহুস সিয়ারে দ্রষ্টব্য।

বি.দ্র. ০২

যাদের হত্যা করা হবে না, তাদেরকে দারুল হারবে ছেড়েও আসবে না। বরং বন্দী করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসবে। এরপর তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপশন রয়েছে। ইমামুল মুসলিমিন মাসলাহাতের বিবেচনায় যেকোনোটি গ্রহণ করতে পারেন। যেমন:

ক. বালেগদের হত্যা করে দেয়া।

খ. গোলাম বাঁদি বানানো।

গ. জিযিয়া প্রদানের শর্তে যিম্মি বানানো।

ঘ. বন্দী বিনিময় করে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা।

ঙ. প্রয়োজনে কিছু কাফেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া।

চ. মাসলাহাত মনে করলে কোনো কাফেরকে বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দেয়া।

গোলাম বাঁদি বানানো হয়তো বর্তমান হালে সহজ হবে না। বাকি অপশনগুলো মাসলাহাতের বিবেচনায় গ্রহণ করতে পারেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা গনিমতের অধ্যায়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

***

১১. যুদ্ধের ময়দানে যেসব আত্মীয়কে আগে বেড়ে হত্যা করা নিষেধ

ونهينا عن ... وقتل أبٍ مشركٍ. وليأب الابن ليقتله غيره.

“(আগে বেড়ে) মুশরিক পিতাকে কতল করতে আমাদের বারণ করা হয়েছে। তবে সন্তান তার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকবে (যাতে পালাতে না পারে এবং যাতে) অন্য কেউ (এসে) তাকে হত্যা করতে পারে।”

ব্যাখ্যা

মুজাহিদের পিতা যদি মুশরিক হয় এবং মুশরিক বাহিনির সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসে, তাহলে সন্তানের জন্য উক্ত মুশরিক পিতাকে হত্যা করার বিধান কি?

ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন: মুশরিক হলেও পিতা মাতা, দাদা দাদি, নানা নানি তথা নিজের উসূলদের কাউকে আগে বেড়ে হত্যা করা যাবে না। কারণ, তাদের মাধ্যমেই সে দুনিয়াতে এসেছে। আগে বেড়ে তাদের হত্যা করে ফেলা এই সম্পর্কের পরিপন্থী হয়। তাছাড়া মুশরিক হলেও পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ কুরআনে কারীমে এসেছে। অতএব, তাদের কেউ কাফেরদের পক্ষ হয়ে ময়দানে আসলে ঐ মুজাহিদের জন্য তাকে আগে বেড়ে হত্যা করা জায়েয হবে না।

তবে সামনে পেলে ছেড়েও দিবে না। বরং আটকে রাখবে। ঘোড়ার পা কেটে দিবে। সংকীর্ণ স্থানে ঢুকিয়ে কাবু করে রাখবে যাতে পালাতে না পারে। অপেক্ষায় থাকবে যেন অন্য কেউ এসে তাকে হত্যা করে। নিজে হত্যা করবে না।

তবে সেখানে যদি তাকে হত্যা করার মতো কেউ না থাকে, তাহলে ছেড়ে না দিয়ে অবশেষে নিজেই হত্যা করে দিবে। -আদদুররুল মুখতার[৪]

এমনিভাবে তারা যদি মুজাহিদের উপর অস্ত্র তাক করে এবং তাকে হত্যা করে ফেলতে চায়, তাহলে মুজাহিদ প্রতিহত করবে। এমনকি যদি পিতা বা দাদাকে হত্যা করা ছাড়া নিজের জান বাঁচানোর কোনো উপায় না থাকে, তাহলে হত্যা করে দিয়ে নিজের জান বাঁচিয়ে নিবে।

---

[৪] (ولا) يحل للفرع أن (يبدأ أصله المشرك بقتل) كما لا يبدأ قريبه الباغي (ويمتنع الفرع) عن قتله، بل يشغله (ل) اجل أن (يقتله غيره) فإن فقد قَتَلَه. –الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 331)

মোট কথা: স্বাভাবিক অবস্থায় নিজে হত্যা করবে না। আটকে রাখবে যাতে অন্য কেউ এসে হত্যা করে। অন্য কেউ না থাকলে নিজেই হত্যা করে দিবে। এমনিভাবে তারা আক্রমণ করলে প্রতিহত করবে। হত্যা ব্যতীত নিজের জান রক্ষার ভিন্ন কোনো উপায় না থাকলে হত্যা করে দিবে। তবে কোনো অবস্থায়ই পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিবে না। কেননা, ছেড়ে দিলে পরে আবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে সামনে আসতে পারে।

***

উপরোক্ত বিধান শুধু পিতা মাতা, দাদা দাদি, নানা নানি তথা নিজের উসূলের ক্ষেত্রে। নিজের ফুরু ও অন্যান্য আকারিব তথা নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। অতএব, নিজের ছেলে বা নাতিকে আগে বেড়ে হত্যা করতে সমস্যা নেই। এমনিভাবে নিজের অন্যান্য নিকটাত্মীয়; যেমন চাচা, মামা, চাচাতো-মামাতো-ফুফাতো ভাই: তাদেরকেও আগে বেড়ে হত্যা করতে সমস্যা নেই।[9]

***

উপরোক্ত বিধান মুশরিকের বেলায়। মুসলিম বাগিদের বেলায় উসূলের পাশাপাশি রক্তসম্পর্কীয় মাহরাম নিকটাত্মীয়দেরও আগে বেড়ে হত্যা করা নিষেধ। যেমন ছেলে, নাতি, চাচা, মামা প্রমুখ। এক্ষেত্রে আগে বেড়ে হত্যা না করে বরং মুশরিক পিতার মতো আটকে রাখবে যাতে অন্য কেউ হত্যা করে দেয়। অন্য কেউ না থাকলে কিংবা তারা আক্রমণ করলে এবং জান বাঁচানোর জন্য হত্যা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ না থাকলে শেষে হত্যা করে দিবে।

রক্তসম্পর্কীয় নিকটবর্তী মাহরাম আত্মীয় ছাড়া অন্যান্য মুসলিম বাগি আত্মীয়দের আগে বেড়ে হত্যা করতে সমস্যা নেই।[10] ওয়াল্লাহু আ ।লাম’

***

9 ولو قال المصنف وقتل أصله المشرك لكان أولى؛ لأن هذا الحكم لا يخص الأب؛ لأن أمه وأجداده وجداته من قبل الأب والأم كالأب فلا يبتدئهم بالقتل. وخرج فرعه، وإن سفل. فللأب أن يبتدئ بقتل ابنه الكافر؛ ... وكذا أخوه وخاله وعمه، المشركون . – البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 85)

10ولا يقتل عادل محرمه مباشرة ما لم يرد قتله. ... (قوله: ولا يقتل) أي يكره له كما في الفتح (قوله: ما لم يرد قتله) فإذا أراده فله دفعه ولو بقتله، وله أن يتسبب ليقتله غيره كعقر دابته، بخلاف أهل الحرب فله أن يقتل محرمه منهم مباشرة إلا الوالدين بحر أي فإنه لا يجوز له قتل الوالدين الحربيين مباشرة، بل له منعهما ليقتلهما غيره إلا إذا أراد قتله ولا يمكن دفعه إلا بالقتل فله قتلهما مباشرة كما مر أول الجهاد. والحاصل أن المحرم هنا كالوالدين، بخلاف أهل الحرب، فإن له قتل المحرم فقط. والفرق كما في الفتح أنه اجتمع في الباغي حرمتان: حرمة الإسلام، وحرمة القرابة. وفي الكافر حرمة القرابة فقط. –الدر المختار مع رد المحتار: 4\265–266